কথায় কথায় সেলিনা হোসেন

নব গোপাল রায়

ভিজিটিং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
বাংলা বিভাগ, টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ
টোকিও, জাপান

বিশ্বনাথ কুইরী

গবেষক,
বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুনশ্চ

॥ 'কি গাব আমি কি শুনাব আজি আনন্দধামে' ॥

নবগোপাল রায় এবং বিশ্বনাথ কুইরী সম্পাদিত বইটি আমার জীবনের একটি অসাধারণ পাওয়া। আমি অভিভূত এবং আনন্দিত। এ আনন্দের কোন সীমা-পরিসীমা নাই। একজন সাহিত্যিকের লেখালেখি যখন অন্যদের ভাবায়, পাঠকের মধ্যে কোন বোধের সঞ্চার করে; তখন সেটাই সাহিত্যিকের অন্যতম পাওয়া। যখন তাঁর লেখালেখি গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে তখন সেটা সাহিত্যিকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। অধ্যাপক নবগোপাল রায় এবং গবেষক বিশ্বনাথ কুইরী দু'জন আমার স্নেহভাজন। দু'জনের প্রবল আগ্রহে এই বইয়ের আনন্দধাম তৈরি হয়েছে। ওরা দু'জনই এমন একটি বইয়ের পরিকল্পনা করেছে। আমার লেখালেখির অন্দরমহলের কথাগুলো ওরা তাদের প্রশ্নের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে বের করে এনেছে আলাদাভাবে। আশারাখি পৃথিবী জোড়া পাঠকের কাছে এই প্রশ্ন বা, কথাগুলো পৌঁছে যাবে। আমার লেখা আমার 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়িয়ে যেভাবে 'বিশ্বলোকের সাড়া' পাচ্ছে তাতে আমি অভিভূত। এই অনুভবটা আরও প্রগাঢ় হবে এই বইয়ের মাধ্যমে এ আমার বিশ্বাস।

একজন লেখককে এভাবে তুলে ধরা অধ্যাপক এবং গবেষকই তা ভাবতে পারেন। তাঁদের ভাবনার জগত আলোড়িত করে লেখককে। নবগোপাল এবং বিশ্বনাথের ঋণ আমি আমৃত্যু শোধ করতে পারব না। আজীবন সাহিত্যের ভুবনে বিচরণ করে ওদের মুখচ্ছবি আমাকে উদ্ভাসিত করে রাখবে। টোকিওর ফরেন ল্যাংগুয়েজ ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগে নবগোপাল পড়ায়, ওখানে আমার গল্প পড়ানো হয়।

বিশ্বনাথ আমার সাহিত্য নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করছে। এতকিছু অর্জন একজন লেখকের বড় পুরস্কার। শুধু অর্থ দিয়ে এমন পুরস্কারের মূল্যায়ন হয় না। এই পুরস্কার আমার সারাজীবনের গর্ব হয়ে থাকবে।

নব এবং বিশ্বনাথের জন্য প্রাণভরা শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানাই, ওদের শ্রম সফল হোক।

শুভাকাঙ্ক্ষী

ঢাকা, বাংলাদেশ

॥ কথামুখ ॥

কংসাবতী নদীর তীরের কোন গ্রাম বা গোয়ালন্দ ঘাট থেকে উঠে কোন গ্রামে ঢুকলে বিশেষ কোন পার্থক্য চোখে পড়েনা। বা, ধরা যাক কলকাতা ও ঢাকা শহরের কথা। দুই শহর বা গ্রাম, তাঁদের শরীর আলাদা, আত্মা এক। সেই একাত্মা মানুষগুলো কখন যে আলাদা হয়ে যায় আর সেই আলাদা হয়ে যাবার আড়ালে ঘটে যায় কত হিসেব নিকেশ, স্মৃতি থেকেও মোছেনা অনেক ক্ষত, এই, কথাগুলোও স্মৃতি থেকে লেখা। কোন এক লেখকের লেখনীতে ধরা পড়ে সেই জবানবন্দী। আর সেই যাপিত জীবনকে কিভাবে দেখেন স্রষ্টা, ইতিহাস-ঐতিহ্য কি করে মিলেমিশে এক হয়ে যায়, সেকথা শুনতেই আমাদের এই পরিকল্পনা।

আমরা প্রতিদিনের যাপিত জীবনে বস্তুবিশ্বের, মানববিশ্বের বা বস্তু-মানবোর্ধ যে সব সৃষ্টির সংস্পর্শে থাকি, তাদের প্রত্যেকটির স্রষ্টার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে না। স্বাভাবিক ভাবেই জখন কোন সৃষ্টির স্রষ্টার সঙ্গ পাই আমরা সেটা কম আনন্দের নয়। আমাদের ক্ষেত্রেও এরকমই হয়েছে। আমরা সাহিত্য পড়ার পরই ভাবি, সে কোন চরিত্র, যার কথা আমরা সাহিত্যিকের দরদী কলমে উঠে আসতে দেখি, কী সেই জীবন যা সাহিত্যিক সামনে থেকে দেখে এরকম জীবনদর্শন তৈরি করেছেন তাঁর সাহিত্যে। আমরা যারা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের লেখালেখি পড়েছি আমাদের মনেও এরকম অনেক প্রশ্নের উদয় হয়েছে, হওয়াটাও স্বাভাবিক। জানতে ইচ্ছে করে কে সেই মালতী, কে সেই সুরেন যারা সীমান্ত রক্ষীদের গুলিকেও ভয় করেনি। কে সেই মনজিলা যে নিজের নারীর স্বাভিমানের কাছে সবকিছুকে উপেক্ষা করে দেখতে পারে, কেমন ছিল সেই দাঙ্গা বিধ্বস্ত উত্তাল দিনগুলি, তারা কারা যারা দেশের মাটি ছাড়তে চায়নি, তাতে তাঁদের নিজের পরিবারের মানুষের রক্ত পর্যন্ত খেতে হলেও তারা স্বদেশের সংজ্ঞা বদলাতে রাজি নন। সাহিত্যিক কোথায় খুঁজে পেলেন মতিজানকে, কোথায় পেলেন সোহরাব আলীকে, কে সেই যুবক যে মাতৃভাষার জন্য নিজের পরিবার-প্রেম ছেড়ে মিছিলে হাঁটে, বুকে গুলি খায়। এসব চরিত্র-ঘটনা কোথা থেকে পাওয়া, যে জীবন দর্শন তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন সেটা

তিনি কীভাবে জীবন থেকে তিলে তিলে অনুভব করেছেন? দেশ-বাস্তু-পরিচয় হারা কোন মানুষগুলোর বিষণ্ণ মুখ, কীভাবে সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে কলম তুলে ছবি আঁকতে বাধ্য করেছে; এসব জিজ্ঞাসা আশা করি যে কোন সংবেদনশীল পাঠকের মনেই জাগে। জন্ম দেওয়ার একটা বেদনা থাকে, সাহিত্যিকেরা নিত্যদিন এত বিচিত্র চরিত্রের জন্ম দিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রসব বেদনা না হলেও বাস্তবের কোন বেদনাগুলো তাঁকে ওইসব চরিত্র নির্মাণে বাধ্য করছে এসব জানার কৌতূহল আমাদের সকলেরই আছে। সাহিত্যিকের প্রত্যেকের কাছে তাঁর সেইসব অভিজ্ঞতা বলা সম্ভব নয়। পাঠকের এই শূন্যতার দেশটা পূরণ করবে আশা করি 'কথায় কথায় সেলিনা হোসেন'।

যে কোন কর্মযজ্ঞেরই একটি ইতিকথা থাকে। আমাদের এই কাজেরও সন্ধ্যেবেলার আলো জ্বালানোর পূর্বে একটা সলতে পাকানোর পর্ব ছিল। সে কথা জানতে আমাদের সঙ্গে আপনাদেরও আরেকটু পিছনে তাকাতে হবে। সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, দুই বাংলা তথা বিশ্বের দরবারে এক চর্চিত নাম। আমরাও তখন নাম শুনিনি এমনটা নয়। কিন্তু নাম শোনা আর একটু পড়া, ঐ পর্যন্তই। তারপর বাংলাদেশ যাওয়া-আসার সূত্রে পরিচয় আরও বাড়তে থাকে। তাঁর লেখালেখি পড়া শুরু হয়েছে আমাদেরও আর পাঁচটা আগ্রহী পাঠকের মতই। ক্রমশ আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে পর্বটা আমাদের এই যাত্রাপথের জন্য সবচেয়ে বেশি সাহস আর আগ্রহ বাড়াল সেটা একটা তিন দিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। 'বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য : প্রতিবেশীর অবস্থান' নামক আলোচনাচক্রে যে চাঁদের হাট বসেছিল, সেখানের অন্যতম অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সেই পর্বে পুরুলিয়ায় তাঁকে কাছে থেকে পাওয়া একটু বেশিক্ষণ ধরে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এতটা সহজ মানুষ, অনায়াসে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, যেমনটা উনি বরাবর করে থাকেন। কয়েকটা প্রশ্ন করে আমাদের মনে হয়েছে যে ওনার এরকম আরও অনেক কথা আছে যেগুলো পাঠকের কাছে পৌঁছানো দরকার। ব্যাস এই হল ভাবনার সূচনা বিন্দু।

তারপর পরিকল্পনা, আরও পড়াশোনা, প্রশ্ন তৈরি করতে লাগলাম আমরা। কিন্তু ভাবনাটা বাস্তবায়িত করা একটু জটিল তো হবেই। কারণ ম্যামের সময় হওয়া, কাঁটাতারের এপার থেকে ওপারের একজন সাহিত্যিককে সাক্ষাৎকার নেওয়া এতটাও সহজ নয়। ম্যামকে জানাই সময় দেওয়ার কথা, উনি উল্লসিত হয়ে সম্মতি জানান। তারপর কোলকাতা, বোলপুর, বাংলাদেশ মোটামুটি এরকম বেশ দীর্ঘসময়ের সাক্ষাত আমাদের এই কাজের উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করেছে। বিশ্বভারতীর সেই বাংলাদেশ ভবনে ম্যাম যখন আসেন, তখন আলোচনাচক্রের মাঝখানে উনি সময় দিয়েছেন, সকালে বা বিকেলে উনি ফোন করে ডেকেছেন, এই স্নেহ পেয়েই মন আপাতভাবে

আনন্দিত হয়েছিল। তারপর কোলকাতাতেও বিভিন্ন সময় উনি আমাদের সময় দিয়েছেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন...উনি কিন্তু নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ওনার কাছ থেকে যা শুনছি তাতে আমাদের উৎসাহ আরও বাড়ছে। তাঁর এত বিচিত্র সৃষ্টির প্রশ্ন আর উত্তর দিয়ে ক্রমশ একটা নতুন সৃষ্টির জন্ম হচ্ছিল। এরকম তিলে তিলে যখন আমাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া শেষ হল ঠিক তারপরই এক বৈশ্বিক মহামারির কবলে পড়লাম আমরা। সবকিছু স্তব্ধ প্রায়, আমাদের যোগাযোগ, কাজও খানিকটা থমকে গেল। তবে এই মেঘ কেটে ধীরে ধীরে আবার নতুন সকালের সূর্য উঠেছে। সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে শুধু নয়, সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের আড়ালে থাকা মানুষ সেলিনা হোসেনকে দেখার সুযোগ আশাকরি এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রতিটি পাঠক পাবেন।

আসলে তিনি যখন জন্মাচ্ছেন (১৯৪৭) তখন ভারতবর্ষের বুক থেকে একটা অংশ দেশভাগের নামে সরে যাচ্ছে। তাঁর পরিবার ভারত থেকে তথাকথিত পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন। সংসারের মূল উপড়ে নতুন দেশের মাটিতে পুঁতে দিতে হচ্ছে। তারপর ভাষা আন্দোলন, নতুন রাষ্ট্র তৈরির দাবি, শাসকের অত্যাচার, বৈষম্য, মুক্তিযুদ্ধ, স্বপ্নের সেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠন; এসবের মধ্যেই তাঁর ছোট থেকে বড়, আর বড় থেকে মানুষ হয়ে ওঠা। এতসবের পরেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা। বিবাহ, পরিবারকেন্দ্রিক সমস্যা, তাঁর মেয়ে লারার মৃত্যু এসব তাঁকে বার বার জীর্ণ করে দিতে চেয়েছে কিন্তু দুরন্ত শৈশব কাটানো সেই লড়াকু, জেদি মেয়েটির জীবনে আসলে সেগুলো কোন নেতিবাচক ভাবনা তৈরি করেনি; বরং তাঁকে ও তাঁর জীবনদর্শনকে আরও গভীর করেছে। সাহিত্যিকের নিজের দেখা জীবন, নিজের প্রজ্ঞাই তো সাহিত্যেও উঠে আসে। তাই হয়ত আমরা উপন্যাসে আলী আহমেদ, সোহরাব আলী, মালতী, বর্ণমালাদের হেরে যেতে দেখি না, স্বজন-স্বদেশ বিয়োগের জ্বালা বুকে নিয়েও তাঁরা নতুন করে সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখে, নতুন করে রাষ্ট্রের স্বপ্নে আনন্দিত হতে পারে। হেরে যেতে যেতেও তারা সকালের আকাশের সূর্য, নদীর জল, প্রকৃতি, মানুষ দেখে আনন্দিত হয়। আসলে এই ইতিবাচক ভাবনা তো স্রষ্টার কাছ থেকেই পাওয়া। আসলে স্রষ্টাকে না জেনে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে কথা বলা নিতান্তই বোকামি, সাহিত্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই জরুরী সাহিত্যিককে জানা। কারণ সব ব্যাখ্যার পরেও একটা ব্যাখ্যা আমাদের জানার থাকে যা না জানলে আমাদের বীজগণিতের অঙ্কের মত এক্স ধরে বিচার করতে হয়। আশারাখি আমাদের এই কাজ সেলিনা হোসেনের প্রতিটি পাঠককে আলোচনা করার সময় সেই এক্স ধরা থেকে বিরত রাখবে। আর এই কাজটির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের কাছেই। উনি সাক্ষাৎকার না দিলে আমরা এই কথাগুলো আপনাদের কাছে

তুলে ধরার সুযোগ কখনোই পেতাম না। লেখিকা এইসময়ের মাঝেও মেইলে সব দেখে দেখে আমাদের জানিয়েছেন, নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তাই এই কাজের যা কিছু প্রশংসার সেটা ম্যামেরই প্রাপ্য, আর যদি নিন্দার ভাগ নেওয়ার প্রশ্ন আসে সেটার জন্য আমাদের ঠিকানা রইল।

আরেকটি কথা ফুটনোট হিসেবে হলেও আমাদের জানাতে হবে। এই সাক্ষাতকারের অডিওগুলোকে ভাষার প্রাথমিক রূপ দিতে (টাইপ) যে আমাদের অক্লান্ত সময় দিয়েছে, সেই নীলকণ্ঠ কুইরীর কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম। খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেকের সাহায্য ছাড়া কোন কাজই হয়না। শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিক উল্লাহ খান না থাকলে এসব কোনকিছুই দানা বাঁধতো না, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। খুবই ব্যক্তিগতস্তরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল মহাশয়ের কথা স্বীকার করতে হবে, বলতে হবে সন্দীপন ধরের কথা, যাদের বিরক্তই করে গেছি অনবরত। পরিশেষে 'পুনশ্চে'র সকলকে ধন্যবাদ, বিশেষত এই কঠিন সময়কালের মধ্যে সন্দীপদা যিনি কিছু না শুনে একনিশ্বাসে বলে দেন, 'আমি করব বই, পাঠাও তাড়াতাড়ি', তাঁকে কি বলে এই ধন্যবাদ জানাবো জানা নেই।

বাকিটা আগামীর কাছে দেখার থাকবে, পাঠকসমাজে গ্রহণীয় হলে ভালো লাগবে।

ভালো থাকুন।

জানুয়ারী, ২০২১।

বিনত,
বিশ্বনাথ কুইরী
নবগোপাল রায়

।। কথায় কথায় ।।

● **প্রশ্ন:** কথার শুরুতেই আপনার ছোটবেলার গল্প শুনতে চাই।

সেলিনা হোসেন: ছোটবেলা সম্পর্কে আমি সবসময় বলি যে, ছোটবেলার অভিজ্ঞতাই হল আমার সাহিত্যে অনুপ্রেরণা। অনেক অনেক বই পড়ে, অনেক লেখকের সম্পর্কে জানলে লেখার আগ্রহ বাড়ে। আমি কিন্তু সেইসব করিনি। আমি ছোটবেলায় একটা দুরন্ত শৈশব কাটিয়েছি; সেই পঞ্চাশের দশকে, আমার সাতচল্লিশে জন্ম, তারপরে আমরা বাবার চাকরিসূত্রে বগুড়ার করতোয়া নদীর ধারে একটা বিশাল এলাকায় ছিলাম। তখন তো এত মানুষ ছিল না, এত ঘরবাড়ি ছিল না। বিরাট প্রকৃতি। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, নদী, বিল, বিলের জলে শাপলা ফুল, ধানক্ষেতের মধ্যে শামুকের ডিম পড়ে থাকে, পাখির বাসা খোঁজা, পাখির ডিম দেখা, পাখির বাচ্চা ধরা, লালপিঁপড়ার কামড় খাওয়া; এই ধরণের একটা দুরন্ত শৈশব কাটিয়েছি। সবচেয়ে যেটা মজার হল, সম্ভবত আমার এই ছোট-খাটো হাইটের জন্য কেউ আমাকে বলেনি, এই ধিঙ্গি মেয়ে এখানে ঘোরাফেরা করিস কেন, বাড়ি যা;এই ধরণের বকা আমি আমার ছোটবেলায় শুনিনি। কিন্তু পাশাপাশি আমি মেয়েদের কি ধরণের নির্যাতন হয়, কি ধরণের বৈষম্য তৈরি হয়; সেটা দেখেছি। একদিকে প্রকৃতির এই বিষয়টা; আরেকদিকে মানুষ, মানুষের সম্পর্কের এই জায়গাটা আমি ছোটবেলায় দেখেছি। যেটা আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার মনে হয়েছে, আমার এই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগানো দরকার। আমি তার আগে লেখা শুরু করেছিলাম কবিতা দিয়ে। কিছু কবিতা ছাপা হয়েছে, দু-চার বছর লিখেছি। পরে আমার মনে হল যে, কবিতা দিয়ে হবে না, গদ্যে যেতে হবে। যে অভিজ্ঞতার কথা বলব শুধু কবিতা দিয়ে একটু না বলে, একটা বড় পরিসর তৈরি করে সেখানে আরও বেশি করে বলতে পারব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সিদ্ধান্ত নিয়ে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে গল্প-উপন্যাস শুরু করি।

তো এই দুরন্ত শৈশবের মধ্যে আমার দুটো ঘটনা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। দুইজন মানুষকে আমি আমার শিক্ষক হিসেবে পেয়ে ধন্য মনে করি, এখন পর্যন্ত। আমার এই চুয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। আমরা যে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, সেখানে একজন হেডমাস্টার ছিলেন, তাঁর একটা পা এক্সিডেন্টে ভেঙে গিয়েছিল;